সংবাদ

তারিখ ... 15 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হোক উন্নত দেশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ

শুভাশিস ব্যানার্জি শুভ

'প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট' (পিসা) যেটি উচ্চমাত্রার শিক্ষা পরিমাপের একটি কর্মসূচি।'যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে তারা যা অর্জন করেছে তা পরিমাপ বা যাচাই করার পদ্ধতি। 'পিসা'র জরিপ ও মূল্যায়নে দেখা যায় যে, ফিনল্যান্ড আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এখন শিক্ষার নেতা বা লিডার। পিসার সব ধরনের সূচকে ফিনল্যান্ড অনেক এগিয়ে আছে। আর তাই এই দেশটিকে শিক্ষার নেতৃত্বদানকারী দেশ বলে ধরা হয়।

গত এক দশক ধরে ফিন্যলান্ডের এই অবস্থা এবং বিদ্যালয়গুলোতে সমতা পরিলক্ষিত হচ্ছে শিক্ষা পরিমাপের সব সূচকে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে সাত বছরের পুর্বে কোন শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না। ১৩ বছরের আগে তাদের কোন ধরনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় না এবং কোন ধরনের হোমওয়ার্ক দেয়া হয় না। শিক্ষা শুরু করার ছয় বছরের মধ্যে পরীক্ষা তো দূরের কথা কোন ধরনের মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্ট করা হয় না। এ তিনটি সূচকের ক্ষেত্রে আমরা যদি বাংলাদেশের কথা ধরি তাহলে আমরা কোথায় আছি। তিন বছর বা সাড়ে তিন বছর হওয়ার আগেই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানেরা জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং পাঠিয়ে দেই।

সেই পাঠানো থেকেই তাকে পড়েতে হচ্ছে কঠিন পরীক্ষায়। ভালো কোন কিন্ডারগার্টেনে ভর্তির জন্য শিশুকে বিসিএস পরীক্ষার মতো প্রিপারেশন নিতে হয়, বিসিএস-এর মতো প্রশ্ন সেট করা হয় এসব পরক্ষীয় (কোন দেশের মুদ্রার নাম, রাজধানীর নাম, কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি), কোচিংয়ে যেতে হয়, নির্দিষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। পরীক্ষা দিতে হয়, ফলাফলের জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতে হয়। চান্স না পেলে তিরস্কার শুনতে হয়। কারণ বাবা-মা যদিও বোঝেন কিন্তু সমাজের কাছে হেয় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা বকাঝকা করেন বাচ্চাকে চান্স না পাওয়ার জন্য। এ নিয়ে বহু লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। এ হ-য-ব-র-ল অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সরকার শিশু শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু অবস্থার কি খুব একটা উন্নতি হয়েছে?

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী সম্প্রতি বলেছেন, শিক্ষার মান বাড়ছে কি কমছে তা প্রাথমিকের শিশুদের ফলাফল দেখে বলা যাবে না। তবে শিওর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ভালো করেছে। কারণ তাদের শিখন পদ্ধতি অনেক বেশি মানসম্পন্ন। তাদের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ পান ও অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন। এখানে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হচ্ছে শিক্ষকদের মান ও প্রশিক্ষণ। যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মান ভালো এবং শিক্ষকরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেসব বিদ্যালয়ের ফলও ভালো। অতএব প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

২০১০ সালে এ পরীক্ষা চালু হওয়ার পর গত বছর (২০১৩) জিপিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আকাশছোঁয়া সাফল্য এসেছিল। জিপিএ-৫ পায় ১ লাখ ৭২ হাজার ২০৮ জন। এবার প্রথমবারের মতো গণিতে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। আর তাই গণিতে অনেক শিক্ষার্থী বিশেষ করে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভালো করতে পারেনি। সেই একই চিত্র প্রতিবছর, এটি পরিবর্তন করার তেমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। শহর-গ্রাম বিভক্তি, ডিজিটাল সুবিধার দিক দিয়ে বিভক্তি- এগুলোর গতি খুব ধীর।

অর্থাৎ বিভক্তিগুলো মিনিমাইজ হচ্ছে খুব ধীরে। অতএব, সরকার তথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি গুরুত্বে সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। আর একটি বিষয় পুনরায় বেরিয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে- হাওর, বাঁওড়, পার্বত্য এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকার বিদ্যালয়সমূহের পারফরম্যান্স সবচেয়ে খারাপ। এটি আমরা সবাই জানি, তারপরও বিষয়টি সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। বোঝাই যাচ্ছে, প্রচলিত পদ্ধতি এখানে কাজ করছেনা। এসব এলাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা, পৃথক কাঠামো জরুরি।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে অন্যভাবে, শিক্ষার্থীদের স্কুল টাইমিং, ছুটি, পরীক্ষা সবই দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে একটু আলাদা হতে হবে তা না হলে এই বিভক্তি সহজে রোধ করা যাবে না। সরকার এ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে দেশব্যাপী পুস্তক বিতরণ উৎসব করছে, বিনামূল্যে পুস্তক কি সব শিক্ষার্থীর দরকার? আমাদের তো বেশি দরকার মানসম্পন্ন শিক্ষক, মানসম্পন্ন শিক্ষাদান। বিনামূল্যের এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত পুস্তক তো খুব আকর্ষণীয় হচ্ছে না, শিক্ষাবান্ধব হচ্ছে না।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সব সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত হলেও সেরাদের তালিকায় তারা আসতে পারছে না। তবে পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় ভালো করেছে। তাদেরও পাসের হার ৯৯.৬২ শতাংশ। গণিত ও ইংরেজি সবার কাছে কঠিন হলেও গড় পাসের চেয়ে এ দুই বিষয়ে পাসের হার বেশি। এ বিষয়টি রহস্যজনক মনে হয়। এই দুই বিষয়ে কি তাহলে গড়পড়তা নম্বর দেয়া হয় না খাতা সঠিকভাবে পরীক্ষণ করা হয় না? নাকি অধিকাংশ পরীক্ষক খাতায় লেখা বিষয়বস্তু না বুঝেও নম্বর প্রদান করে থাকেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার।

একবার যদি শিশু তথাকথিত নামকরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারল তো শুরু হয়ে গেল ক্লাসওয়ার্ক, হোমওয়ার্ক, ক্লাসটেস্ট, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, পাক্ষিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষা, চূড়ান্ত পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার বেড়াজালে শিশুদের জীবন থাকে ব্যস্ত-মহাব্যস্ত, জীবন ও জগতকে তারা দেখতে থাকে অন্যভাবে। যে স্কুল যত বেশি পরীক্ষা নিতে পারে এবং বাচ্ছাদের চাপে রাখতে পারে সেই স্কুল তত বেশি ভালো বলে মনে করা হয়।

জাতীয় পর্যায়েও চালু করা হয়েছে নতুন নতুন পরীক্ষা। সারা জীবনই যেন পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষা মানে মজার কিছু নয়, পুরোটাই ভেঁতো, অথচ জ্ঞান আহরণ করা এবং করানো যে কত মজার সেই পুরো ত্যথটিকেই আমরা ভুল ভাবে উপস্থাপন করছি এবং প্র্যাকটিস করছি।

ফিনল্যান্ডের শিক্ষার আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- লো-পারফরমার এবং উচ্চ পারফরমাদের মধ্যে খুব আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকে না- যেটি আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও অরগানাইজেশন অফ ইকোনোমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওএসিডি)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্লাস টিচার ও বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকরা প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করেন বিষয় নির্বাচনে এবং শিক্ষাদানে। সবেচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ফিনল্যান্ডের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শেখায় তারা নিজেরা কিভাবে নিজেদের মূল্যায়ন করবে। সেটি করা হলে সবই তো করা হয়। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা জানে না তারা কোন বিষয় কেন পড়ছে। পড়ার পর কতটা জেনেছে বা কতটা জানা দরকার। তারা শুধু জানে গতবার এ প্রশ্নটি পরীক্ষায় এসেছে এবার এটি আসবে না অর্থৎ বেজোড় বছরের প্রশ্নপ্রত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলেই পরীক্ষায় টপ স্কোরিং করা যায়।

ওই দেশে শিক্ষকদের ডাক্তার এবং আইনজীবীদের মতো মর্যাদা দেয়া হয় সামাজিকভাবে। তাই শিক্ষক হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীকে 'শিক্ষক প্রস্তুতি প্রোগ্রাম'-এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তারা প্রশিক্ষণ এমনভাব পান যাতে শিক্ষার্থীদের গলদ এবং মূল রোগ নির্ণয় করতে পারেন এবং সে অনুয়ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, তাদের প্রশিক্ষণটি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল। আমাদের শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের চেয়ে ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকদের সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় কম্পিটেন্সি ও সামাজক দক্ষতা নির্ণয় করা যাবে।

শিক্ষা যাতে বাস্তব জীবনে কাজে লাগে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে। শিক্ষা কিভাবে এবং শ্রেণীকক্ষকে কিভাবে আনন্দময় করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থ ব্যয় করতে হবে, শিক্ষকদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। অপ্রয়োজীয় খাতের খরচ কমাতে হবে, মানসম্পন্ন শিক্ষক অবশ্যই নিয়োগ দিতে হবে। তবেই শিক্ষার মান নিশ্চিত হবে। উজ্জ্বল হবে দেশের ভবিষ্যৎ।

[লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক]
jsb.shuvo@gmail.com